“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর ৮ম পুনর্মিলনী, ২০১৬”

তারিখঃ ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬; শুক্রবার, সকাল ৯.৩০ ঘটিকায়।

স্থানঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি)।

প্রধান অতিথি:মাননীয় বিচারপতি জনাব সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা
বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ৮ম পুনর্মিলনী ২০১৬ অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, সংগঠনের সভাপতি ও দর্শন বিভাগের চেয়ারপার্সন জনাব অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার রায়, উপস্থিত প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য, জনাব অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, দর্শনশাস্ত্রের গুণী নবীন ও প্রবীন অধ্যাপকবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রীগণ, বিভিন্ন পেশা এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, দর্শন বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর প্রিয় সদস্যবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ এবং সুধীমন্ডলী।

নমস্কার ও শুভ সকাল।

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর ৮ম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির দুর্লভ সম্মান দিয়ে আপনারা যে উদারতা প্রদর্শন করেছেন সেজন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। শীতের এই রোদ্রকরোজ্জ্বল সুন্দর সকালে এ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে আপনাদের সাথে শরিক হতে পেরে নিজকে ধন্য মনে করছি। পেশাগতভাবে আমি একেবারে ভিন্ন বলয়ের মানুষ। আমি আইন পেশার মানুষ হয়েও আপনাদের মত গুণী দার্শনিক সমাজের আমন্ত্রণ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছি। গুণীজনদের সমাবেশে অংশগ্রহণ করা সত্যিই সৌভাগ্যের বিষয়। ভাষার এ মাসে ভাষা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারী অকুতোভয় বীর সৈনিকদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, ভাষা আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হওয়ায় এই ভূ–খন্ডের মানুষ হয়েছে পরম সম্মানিত। উপস্থিত সকলের প্রতি রইল আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ও গভীর শ্রদ্ধা।

দর্শন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব রঞ্জিত কুমার সরকার, সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার জনাব অরুনাভ চক্রবর্ত্তীর মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমার প্রাথমিক সম্মতি ও শিক্ষকবৃন্দকে নিয়ে আসার অনুমতি চেয়েছিলেন। আমার মৌখিক সম্মতির প্রেক্ষিতে তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের নিয়ে আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ জানানোর পূর্বেই দুখঃজনক ভাবে রেল দূর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন। আমি দর্শন বিভাগের এই কৃতী ছাত্রের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক, সমবেদনা ও তাঁর আত্মার মুক্তি কামনা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

২. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনো দিক নেই যা দর্শনের আওতাভুক্ত নয়। দর্শন বাস্তবের সাহায্যে অবাস্তবের বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে বস্তুপদ্ধতির একটা ব্যাপক আলোচনা করে। দার্শনিক কেয়ার্ড এর উক্তির প্রতিধ্বনি করে

বলা যায় যে, **মানব অভিজ্ঞতার এমন কোনো দিক নেই, সমগ্র জগৎসত্তার মধ্যে এমন কিছু নেই যা দর্শনরাজ্যের বাইরে পড়ে বা যার দিকে দার্শনিক অনুসন্ধান প্রসারিত হয় না।** অবশ্য এ কথার অর্থ এ নয় যে, দর্শন সকল প্রকারের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং খন্ড খন্ড জ্ঞান দান করাই এর উদ্দেশ্য। দর্শন জগৎ-জীবন, জগৎ-জীবনের স্বরূপ ও মূল্য বিষয়ক এক সামগ্রিক আলোচনা পদ্ধতি।

৩. দর্শনের কত রকম সংজ্ঞা আছে, জগতে কত বিচিত্র ধারায় ও আকৃতিতে দর্শনের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটেছে, বিজ্ঞানের সাথে দর্শনের কি সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে, দর্শন-পাঠ ও দর্শনচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা কি এবং সাধারণভাবে বর্তমান জগতে কত বিভিন্নমুখী দর্শন-চিন্তা জ্ঞানানুরাগীদের চিন্তাকে উদ্বেল করে তুলছে, তা আপনারা সম্যক জ্ঞাত আছেন। দর্শন যে একটি জীবন্ত শাস্ত্র এবং আমাদের প্রতিদিনকার উপলব্ধির বাইরে একটি দর্শন যে আমাদের জীবনে প্রতিনিয়তই ক্রিয়াশীল। দর্শন অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানব সভ্যতা বিকাশে, মানুষের সামগ্রিক উন্নতিতে দর্শনের দান অপরিসীম। এর চিরন্তন মূল্যকে উপলব্ধি করতে হলে এর বিষয়বস্তু ও অর্থ সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার জ্ঞান থাকতে হবে। দর্শনের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য বিভিন্ন দার্শনিক যেমন পলসন্, ভূণ্ড, হার্বার্ট স্পেনসার, প্লেটো, অ্যারিস্টোটল, শেলিং, হেগেল, কূল্প, মারভীন, ভ্যাবারবেগ্, ওয়েবার, ভলফ্, রবার্টসন্, রাধাকৃষ্ণ বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে দর্শন শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন বিধায় তাঁরা দর্শন চর্চাকারীদের নিকট প্রাতঃস্মরণীয়। যদিও দর্শনের সমগ্রতা রক্ষা করা তাঁদের কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এক কথায় বলা যায় দর্শন সমগ্র সত্তার প্রকাশ, স্বরূপ ও আদর্শ উপলব্ধির যুক্তিগ্রাহ্য বিজ্ঞান।

৪. দর্শন শব্দটির সরল অর্থ 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ' বা 'সত্য-সন্ধান'। পূর্বে জ্ঞানের যে কোনো শাখাকে দর্শন বলা হতো। মানুষের জ্ঞানের সীমা ছিল তখন স্বল্প। তাই মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে চিন্তা করতে পারতো না। ফলে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে আলাদা করা তাদের পক্ষে কঠিন কাজ ছিল। কাজেই জ্ঞানের যে কোনো শাখাকে তারা দর্শন নামে অভিহিত করতো। ধীরে ধীরে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হতে থাকে। আর এ জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ বিজ্ঞানসমূহকে পৃথকভাবে পাঠ করতে আরম্ভ করে। তারা আবার জগতের বিভিন্ন অংশের পাঠকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে। প্রাণিজগৎ সম্পর্কীয় আলোচনার নাম দেয় তারা প্রাণিবিদ্যা, জড়জগৎ সম্পর্কীয় আলোচনার নাম দেয় পদার্থবিদ্যা আর মনোজগৎ সম্পর্কীয় আলোচনার নাম দেয় মনোবিদ্যা। তারা দর্শনের জগতকেও আলাদা করে। দর্শনকে তাঁরা আর কোনো বিশেষ বিভাগের পাঠ বলতে রাজী নয়। দর্শনকে এখন তারা পূর্বের মতো কেবল নিত্যের এবং বস্তুস্বরূপের পাঠ বলে না। দর্শনকে এখন তারা জ্ঞানের এমন উচ্চতম শাখা বলে অভিহিত করে যার উদ্দেশ্য খণ্ড

সত্যকে সুসংবদ্ধ ও সুসংহত করে সত্তার এক অখণ্ড বুদ্ধিগ্রাহ্য ধারণা দেয়া। সে অখণ্ড ধারণার ভেতর সত্তার নিত্যের দিক ও প্রকাশের দিক উভয়ই থাকবে।

৫. প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষই একমাত্র প্রাণী যার কাছে জীবনযাপনই বেঁচে থাকার একমাত্র চিহ্ন নয়। মানুষ তার জীবনযাপনের দৈনন্দিন বা আটপৌরে গতানুগতিকতার মাঝেও এক ধরণের সিরিয়াস 'জীবনবোধ' -এর লালন করে। এই 'জীবনবোধ'ই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বকীয়তা দান করেছে। এই 'জীবনবোধ' দ্বারা তাড়িত বলেই মানুষ নিছক 'জীবন যাপন' করতে পারে না, বরং তাকে একটি 'অর্থময়' জীবন যাপনের বেদনা সবসময় অস্থির করে রাখে। এই অস্থিরতা হলো বেঁচে থাকার একটি পরিপূর্ণ 'অর্থ' সন্ধানের অস্থিরতা। প্রতিটি মানুষ এই অস্থিরতা দ্বারা তাড়িত, কিন্তু সকলেই সমানভাবে এই অন্তর্নিহিত অস্থিরতা সম্বন্ধে অবহিত নয়। জীবনের এই 'পরিপূর্ণ অর্থ' সন্ধানের অস্থিরতা দ্বারা সবচেয়ে বেশি কম্পমান যারা, তারাই হলেন 'দার্শনিক'। দার্শনিকতা কোনো গন্তব্য নয়, এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি। যিনি দার্শনিক তিনি মূলত পৃথিবীর সকল মানুষের পক্ষ হয়ে নিরবে এক সুবিশাল দায় পালন করে যান তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন সাধনার মাধ্যমে। সেই সাধনা হলো পূর্ণাঙ্গ অর্থপূর্ণ এক জীবনবোধের লালন ও বিকাশের প্রচেষ্টা।

৬. সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্বাধীন চিন্তার ঊষালগ্ন থেকেই দর্শন তার নিজ মহিমায় সমুজ্জ্বল। দার্শনিক সমাজ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির আলোকে জগৎ ও জীবনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের যৌক্তিক চিন্তার ফলেই উন্মোচিত হয়েছে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত, উন্নততর চিন্তা। দার্শনিকদের দেয়া সুচিন্তিত অনুমান, প্রকল্প ও ধারণাকে কাজে লাগিয়েই বিজ্ঞানীরা চালিয়েছেন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। রাষ্ট্র বা সমাজের এমন কোনো দিক নেই যেখানে দার্শনিকদের অবদান নেই। দর্শন জ্ঞান ও সত্যের অনুসন্ধান করে। দর্শন ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের চর্চা করে; মুক্তবুদ্ধি ও নৈতিক চেতনাকে শাণিত করে। দর্শন জাতিকে পথ দেখায়; অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যায়। দার্শনিকবৃন্দ ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চায় সর্বদা থেকেছেন আপোষহীন। যুগে যুগে দার্শনিকরা রাজশক্তি-অপশক্তির কাছে মাথা নত না করে, সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে জ্ঞানচর্চা করেছেন, এখনও করছেন। অন্যায়ের সাথে আপোষ না করে বহু দার্শনিক ক্ষমাভিক্ষার পরিবর্তে সহাস্যে মৃত্যুদন্ডও গ্রহণ করেছেন। সক্রেটিস, ব্রুনোসহ অনেক দার্শনিক জীবন দিয়েছেন, সহ্য করেছেন নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচার। এমন আপোষহীন দার্শনিকবৃন্দকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। দর্শনচর্চার মূল্য সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেছেন, "আইনের ভয়ে অন্যেরা যা করে থাকে, স্বেচ্ছায় ও

সানন্দে তা করার প্রেরণা ও ক্ষমতা আমি দর্শন থেকে পেয়েছি"। অ্যারিস্টটলের এ উক্তির মধ্যে রয়েছে দার্শনিক মনোবৃত্তির সারাৎসার। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা সম্পর্কেও আমরা জানি।

৭. বিশিষ্ট রোমান দার্শনিক বিথিয়াস এর The Consolation of Philosophy গ্রন্থের মূলবক্তব্য ছিল এরকম – জ্ঞান, সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও সুনীতির চর্চা তথা মহৎ মানবোচিত জীবন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই দর্শন। আর যাঁরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও এ লক্ষ্যের অভিমুখে যাত্রা অব্যাহত রাখেন, কোনো প্রলোভন-প্ররোচনায় সেই পথ পরিহার করেন না, তাঁরাই প্রকৃত দার্শনিক।

৮. ন্যায়বিচার ধারণার উন্নয়ন মূলত নৈতিক ও নীতি সম্বলিত বিষয়াবলী ও ঘটনা (দর্শন) থেকে উদ্ভব ঘটেছে। যা পরবর্তীতে আইনের মূলনীতি হিসেবে আদালতে ব্যবহৃত হয়। দর্শনে আইনের কথা, নীতিবাক্য হিসেবে লিপিবদ্ধ থাকে এবং সেগুলো পরবর্তীতে রাষ্ট্রযন্ত্রে বিধিবদ্ধ আইনে রূপ লাভ করে মানবিক আচার-আচারণ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ভাল মানুষ হওয়ার জন্য সবাইকে দার্শনিক হতে হবে এমনটি নয়, তবে দর্শন বিজ্ঞান জানা ভালো। দর্শনের জ্ঞান থাকলে মানুষ সহজাত প্রবৃত্তি থেকে আইন মানে ও আইন মান্যকারী হয়। দর্শন ও আইনের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ়। একটি অপরটির সম্পূরক ও পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি কল্পনা করা যায় না। কেননা আইনের ভিত্তি অনেকাংশে দর্শনের ভিত্তির উপর নির্ভরশীল। আইনের পরিধি মূলতঃ দর্শনের পরিধির মধ্যেই আবর্তিত। তবে দর্শন সবসময় বাস্তবতা বিবেচনায় আইনের মত শক্তিশালী নয়। গণতন্ত্রের বিকাশে রাষ্ট্র ও সমাজ বির্নিমাণে আইনের প্রয়োগের পাশাপাশি দর্শনের ভূমিকা কোন দিক থেকে কম নয়। একজন ভালো আইন বিশেষজ্ঞ হতে হলে তাকে অবশ্যই দর্শন বিজ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে। সমাজের সকলেই দার্শনিক হবেন সেটি প্রত্যাশিত নয়, তবে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একাত্মতা পোষণ করা অপরিহার্য। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে দর্শন কাজ করে। যুগে যুগে দার্শনিকরা মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের কাছে মাথা নত না করে, সত্যনিষ্ঠভাবে জ্ঞানচর্চা করেছেন, এখনও করছেন। এমন ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রাতঃ স্মরণীয় দার্শনিকবৃন্দ মানব সভ্যতার বাতিঘর।

৯. দার্শনিক সিসেরো বলেছেন – "দর্শন আমাদের জীবনের পথ পরিচালক, সত্যের বন্ধু এবং অন্যায়ের শত্রু"। এ বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত আছে দর্শনের ব্যবহারিক মূল্য। দর্শন বাস্তবতা বিবর্জিত কোন শাস্ত্র নয়। মানবকল্যাণই দর্শন।

১০. আমাদের দেশের দার্শনিকবৃন্দও চিন্তার জগতে পিছিয়ে নেই। আমরা জানি, শহিদ ড. জি. সি দেবের জীবনদর্শন। তাঁর সাদাসিধে এবং নির্মোহ জীবনযাপনে অনেক শিক্ষণীয় আছে। সাইদুর রহমানের কল্যাণদর্শনের কথাও আমরা জানি। আবুল হাশিম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, সরদার ফজলুল করিমসহ

আরও অনেকের অবদানের কথা আমরা জানি। কেবল দর্শনশাস্ত্র পাঠ করলেই দার্শনিক হওয়া যায় না, আবার দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন না করেও দার্শনিক হওয়া যায়। জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বশিক্ষিত দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরসহ এমন অনেক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা শ্রেণিকক্ষে দর্শন অধ্যয়ন করেননি।

১১. আমার মতো একজন দর্শনে অপটু আর বেশি তাত্ত্বিক কথা বলা আপনাদের মত জ্ঞানী-গুণী দার্শনিকদের কাছে শোভা পায় না। মানুষ যাতে সুন্দর, নৈতিক ও অর্থবহ জীবনযাপন করতে পারে তার নির্দেশনা দেয় দর্শন। দর্শন চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। প্রকৃত দর্শন মানেই জীবনদর্শন। নানারকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাঁরা সমুন্নত রাখেন প্রজ্ঞা ও বিবেকের বাণীকে, তাঁরাই প্রকৃত দার্শনিক। দর্শন নৈতিক প্রেরণার আধার।

১২. বিজ্ঞানের যুগে বস্তুগত চাহিদার কারণে আজ বিশ্বময় মানবিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত। নৈতিক মূল্যবোধ সমাজজীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করে। নৈতিক মূল্যবোধকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষার সকল স্তরে এবং সকল বিষয়ে দার্শনিক নৈতিকতার পাঠ অপরিহার্য। নৈতিকতার তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করলেই চলবে না। কাজের মাধ্যমেই এর পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে হবে। নৈতিকতা শিক্ষা, অভ্যাস ও চর্চার ব্যাপার। মানবজীবন ও সমাজকে কল্যাণময় করে তুলতে এবং সঠিক জীবনদর্শন উপলব্ধির জন্য দার্শনিক নৈতিকতার জ্ঞান আবশ্যক।

'কে বড়?' প্রবন্ধে 'বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, দর্শনের সেখানে শুরু'-এ সত্য প্রতিষ্ঠায় তিনি বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন। 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধে পঞ্চভূত বলতে পাঁচটি জড় উপাদানের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাংখ্য দর্শনের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। দার্শনিকদের মত হলো জগৎ পঞ্চভূতের সৃষ্টি। কিন্তু আজকে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এ ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে জগৎ ১০৭টি মৌল উপাদানে গঠিত। ত্রিবেদী দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করেছেন।

> "দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ নাই; কিন্তু দর্শন যে চোখে দেখে, যে পথে চলে, বিজ্ঞান সে চোখে দেখে না, সে পথে চলে না। উভয়েই জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চাহে যে, জগতের মূল উপাদান কি কি। কিন্তু দার্শনিক যেভাবে, যে প্রণালিতে বিশ্লেষণ করেন, বৈজ্ঞানিক সেভাবে, সে প্রণালিতে করেন না। এককে দার্শনিক বিশ্লেষণ, অন্যকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বলা যাইতে পারে।"

১৩. আমি এই সুযোগে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলতে চাই। একটি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ভবিষ্যত বিনির্মাণের কর্মশালা, উচ্চতর শিক্ষার এবং গবেষণার পাদপিঠ। বিশ্বের বিভিন্ন

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গঠনে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দেখা গেলেও এর মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য দৃশ্যমান হয় না। শিক্ষাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। শিক্ষাই জীবনের আলোকবর্তিকা, এ আলো দ্বারা মানুষ নিজকে চিনতে ও জানতে চেষ্টা করে। মানুষের অজানাকে জানার চিরন্তন বাসনা শিক্ষার মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়। মানব মনের অন্তর্নিহিত মৌলিক ও সুপ্ত ভাবধারা শিক্ষার জাদুর কাঠির স্পর্শে প্রজ্জ্বলিত হয় এবং জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে পরিপূর্ণতা পায়। আমাদের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাজকে মনে রাখতে হবে- জ্ঞান অর্জনের জন্য ধৈর্য, তিতিক্ষা ও সাধনা ছাড়া জ্ঞানের দীপশিখা জ্বলবে না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, কাব্য, দর্শন এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেতে হলে আমাদের জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হতে হবে। গৌরবের শীর্ষ শিখরে পৌঁছানোর জন্য কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নেই। উচ্চ শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে প্রযুক্তিভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা অত্যাধুনিক ও সময়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। শুধু ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ থাকলেই হবে না। তা হওয়া উচিত উচ্চ গতিসম্পন্ন। ই-বুক, ই-টেক্সট বুক, ই-জার্নাল, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রবন্ধ এর সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বোচ্চ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা সংগত এবং সমীচীন।

সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিজ্ঞান গবেষণায় আরো অধিকতর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুণগত শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ বিনির্মাণে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে- এ আমাদের বিশ্বাস। ছাত্র বান্ধব শিক্ষকের পদভারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ভরে ওঠবে এবং জাতির অগ্রগতিতে দৃশ্যমান ও কার্যকর ভূমিকা রাখবে। বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ছাত্র-শিক্ষক এবং সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিবর্গকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৪. ভারতীয় অবিসংবাদিত জাতীয়তাবাদী, দার্শনিক, ধর্মগুরু এবং কবি শ্রী অরবিন্দ একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে অমিয়বাণী শুনিয়েছেন তা আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তাঁর মতেঃ

- It is essential that society should refuse to give exclusive importance to success, career and money, and that it should insist instead on the paramount need of the full and real development of the student by contact with the spirit and the growth and manifestation of the truth of the being in the body, life and mind.
- The country must give top priority of the needs of education, and organize the whole life of the nation as a perpetual process of education.

- The country must make full and wise use of all the modern techniques of communication, such as, cinema, television, books, pictures and magazines, for spreading the ideal of perfection.
- Permanent exhibitions and museums should be planned all over the country, even in villages, which could be the centres of stimulating knowledge, including the inner significance and goal of evolution.
- Teachers must grow into real examples of the perfection that is aimed at.
- The country as a whole should engage itself in the activity of the discovery and realisation of its true mission.

১৫. যুগে যুগে দার্শনিকেরা অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও অহিংসার বাণী আমাদের শুনিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তিনি চেয়েছেন সাম্প্রদায়িক বিভেদ মুক্ত সম্প্রীতি। তিনি অসাম্প্রদায়িক ও অহিংসতার বাণী শুনিয়েছেন যা যুগে যুগে বিশ্বের শান্তি প্রিয় মানুষ হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে লালন করবে। উল্লেখ্য যে, মহাত্মা গান্ধী জীবনের শেষ সাক্ষাৎকার দেন সাংবাদিক মার্গারেত বউর্কির নিকট হোয়াইট লাইফ মেগাজিনের জন্য। তিনি প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি আপনার অহিংস (non-violence) নীতি থেকে বিচ্যুত হবেন না, এমনকি একটা শহরে আনবিক বোমা আক্রমনের পর। উত্তরে তিনি বললেন যদি প্রতিরোধবিহীন নাগরিকগণ অহিংসার চেতনায় মারা যায়, তাঁদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না।

প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার মহাত্মা গান্ধীর একজন অন্ধভক্ত। বিখ্যাত সিনেটর হোবার্ট হুমফারী মারা গেলে তাঁর আত্মার সম্মানে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে অঙ্কিত বাক্য সমূহ পড়েন-

"commerce without ethics;
pleasure without conscience;
politics without principle;
knowledge without character;
science without humanity;
wealth without work;
worship without sacrifice."

১৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এই বিভাগের ছাত্রদের রয়েছে অনন্য অবদান।

১৭. আমি আর আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। আমি আশা করব দ্বন্দ্ব-সংঘাত, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতাসহ জাতীয় বিভিন্ন সংকট সমাধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের দার্শনিক সমাজ অনেক

প্রতিকূলতা ও বৈপরিত্যের মাঝেও অতীতের ন্যায় জাতিকে পথ দেখাবে, জাতির প্রয়োজনে রক্ষাকবচের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

১৮. ঐতিহ্যবাহী দর্শন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন মানবসমাজকে মহৎ কাজে অনুপ্রাণিত করবে। এ মিলনমেলার নিরন্তর সাফল্য কামনা করছি। এই অ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘজীবি হউক-এ প্রত্যাশায় সবাইকে আবারও অনেক শুভেচ্ছা।